বিচিত্র প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিচিত্র প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
কলিকাতা

প্রকাশ বৈশাখ ১৩১৪
পুনর্মুদ্রণ ১৯১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ চৈত্র ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৩৪৮
তৃতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৫৫
পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, কার্তিক ১৩৬৪, ভাদ্র ১৩৬৫, শ্রাবণ ১৩৬৭
জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ : ১৮৮৫ শক

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

৮·১

১৩১৪-১৫ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ রূপে ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে বিচিত্র প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ সালে ইহার পুনর্মুদ্রণ।

১৩৪২ সালের চৈত্র মাসে বিচিত্র প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে 'রাজপথ', 'য়ুরোপযাত্রী', 'পঞ্চভূত', 'জলপথে', 'ঘাটে', 'স্থলে', এবং 'বন্ধুস্মৃতি'-অংশে মুদ্রিত 'সতীশচন্দ্র রায়' ও 'মোহিতচন্দ্র সেন' এই কয়টি প্রবন্ধ বর্জিত হয়। তাহার কারণ, ইহার অধিকাংশই গ্রন্থান্তরে মুদ্রিত হয়। 'রাজপথ' গল্পগুচ্ছের প্রথম খণ্ডে, 'য়ুরোপযাত্রী' পাশ্চাত্য-ভ্রমণে; 'পঞ্চভূত' স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে; 'জলপথে', 'ঘাটে' ও 'স্থলে' ছিন্নপত্রে। 'বন্ধুস্মৃতি'-অংশের প্রবন্ধ দুইটি অন্য গ্রন্থে সংকলনের অপেক্ষায় থাকে।

"বিষয় ও ভঙ্গীগত মিল থাকায়" 'ছবির অঙ্গ', 'সোনার কাঠি' 'আষাঢ়' ও 'শরৎ' এই চারিটি প্রবন্ধ পরিচয় গ্রন্থ হইতে লইয়া[১] বিচিত্র প্রবন্ধের উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ করা হয়। 'নানা কথা' ও 'পথপ্রান্তে' নামক দুইটি পুরাতন রচনাও এই সংস্করণে প্রথম গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'চিঠির টুকরি' নামে একটি নূতন বিভাগে ১৩৩২-৪২ সালে লিখিত পঁচিশখানি চিঠিও প্রকাশিত হয়।

বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে নূতন কোনো রচনা যোগ করা হয় নাই, পূর্বানুসৃত নিয়মে 'অসম্ভব কথা' ও 'চিঠির টুকরি' বর্জিত হইয়াছে; 'অসম্ভব কথা' গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, এবং 'চিঠির টুকরি'র অধিকাংশ চিঠি পত্রধারার তৃতীয় খণ্ডে অর্থাৎ 'পথে ও পথের প্রান্তে' পুস্তকে অন্যান্য চিঠির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

১ পরিচয় গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, পরিচয় এখন আর স্বতন্ত্র মুদ্রিত হয় না; রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাদশ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট আছে।

সূচীপত্র

ভূমিকা

এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ, ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।

প্রকাশসূচী

প্রবন্ধ	বর্ষ ও মাস	পত্রিকা
সরোজিনী-প্রয়াণ	১২৯১ শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ	ভারতী
নানা কথা[১]	১২৯২ জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র	ভারতী
ছোটোনাগপুর[২]	১২৯২ আষাঢ়	বালক
রুদ্ধ গৃহ	১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক	বালক
পথপ্রান্তে	১২৯২ অগ্রহায়ণ	বালক
লাইব্রেরি	১২৯২ পৌষ	বালক
নববর্ষা[৩]	১৩০৮ শ্রাবণ	বঙ্গদর্শন
কেকাধ্বনি	১৩০৮ ভাদ্র	বঙ্গদর্শন
বাজে কথা	১৩০৯ আশ্বিন	বঙ্গদর্শন
মা ভৈঃ	১৩০৯ কার্তিক	বঙ্গদর্শন
পরনিন্দা	১৩০৯ অগ্রহায়ণ	বঙ্গদর্শন
রঙ্গমঞ্চ	১৩০৯ পৌষ	বঙ্গদর্শন
পনেরো-আনা	১৩০৯ মাঘ	বঙ্গদর্শন
বসন্তযাপন	১৩০৯ চৈত্র	বঙ্গদর্শন
মন্দির	১৩১০ পৌষ	বঙ্গদর্শন
পাগল	১৩১১ শ্রাবণ	বঙ্গদর্শন
আষাঢ়	১৩২১ আষাঢ়	সবুজপত্র
সোনার কাঠি	১৩২২ জ্যৈষ্ঠ	সবুজপত্র
ছবির অঙ্গ	১৩২২ আষাঢ়	সবুজপত্র
শরৎ	১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন	সবুজপত্র

সাময়িক পত্রে শিরোনাম ১ বিবিধ প্রসঙ্গ ২ দশ দিনের ছুটি ৩ মেঘদূত

সরোজিনী-প্রয়াণ

অসমাপ্ত বিবরণ

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩শে মে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে 'সরোজিনী' বাষ্পীয় পোত তাহার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্মস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব— তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ-মানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরম-পরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া-ঠাকুরানীর নিকটে ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় শুনা গেল তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্তিনী হইবেন। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে, আমরা যে পথে যাইতেছি সে পথ দিয়া বরিশালে যাইব বলিয়া অনেকে বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরা পাছে সেইরূপ ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোটো ছোটো সরু সরু আঙুলের নখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময় নখাগ্র হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ সম্ভব সমস্ত নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সকালবেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষত চিৎপুর রোড। সকালবেলাকার প্রথম সূর্যকিরণ পড়িয়াছে শ্যাক্‌রা গাড়ির আস্তাবলের মাথায়, আর এক-সার বেলোয়ারি-ঝাড়-ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস-ল্যাম্প্‌গুলোর গায়ে সূর্যের আলো এমনি চিক্‌মিক্ করিতেছে, সে দিকে চাহিবার জো নাই। সমস্ত রাত্রি

নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকালবেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চক্‌চকে মহত্ত্ব-লাভের চেষ্টায় আছে। ট্রামগাড়ি শিস দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনও যাত্রী বেশি জোটে নাই; ম্যুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুটপাথের পার্শ্বে সারি সারি শ্যাকরা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া; সেই অবসরে অশ্বচর্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কালগুলা ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যন্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরসতা সম্বন্ধে কোনো প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম খাসির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড়ো বড়ো হাতে মস্ত মস্ত রুটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুস নির্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুন জ্বালানো হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ-বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেহ-বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ-বা লাল কলপ দেওয়া দাড়ি লইয়া চোখে চশমা আঁটিয়া একখানা ফার্সি কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মসজিদ; একজন অন্ধ ভিক্ষুক মসজিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গার ধারে কয়লাঘাটে গিয়া পৌঁছানো গেল। সমুখ হইতে ছাউনি-ওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড়ো বড়ো চটিজুতার মতো দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অনুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্‌চট্‌ করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর

হইয়া পড়িয়াছে। একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না— আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কী মনে করিয়া আত্মসম্বরণপূর্বক তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। এ বলে 'আমার নৌকায়', ও বলে 'আমার নৌকায়' ; এইরূপে মাঝির তরঙ্গে আমাদের তনুর তরী একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার মাঝখানে আবর্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্বজন্মের বিশেষ একটা কী কর্মফলে, বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশি ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোটো ছোটো নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে ; আপনার দেমাকে আপনি কাত হইয়া পড়ে বা। একটা মস্ত স্টীমার দুই পাশে দুই লৌহতরী লইয়া আশপাশের ছোটো ছোটো নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাভরে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধূম নিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনোযোগ দিয়া দেখি আমাদেরই জাহাজ— রাখ্ রাখ্, থাম্ থাম্। মাঝি কহিল, 'মহাশয়, ভয় করিবেন না, এমন ঢের বার জাহাজ ধরিয়াছি।' বলা বাহুল্য এবারও ধরিল। জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠানো গেল, তাহার পর আমার ভাজ-ঠাকুরানী যখন বহু কষ্টে তাঁহার স্থলপদ্ম পা দুখানি জাহাজের উপর তুলিলেন তখন আমরাও মধুকরের মতো তাহারই পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

২

যদিও স্রোত এবং বাতাস প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর ঊর্ধ্ব শুণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশৎ-তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল। আমরা ছয় জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ কর্তাবাবু এই সাত জনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় কেদারা লইয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপরে কেবল একটি ছাত আছে। সম্মুখ হইতে হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফর্‌ ফর্‌ আওয়াজ করিতে থাকিল এবং আমার ভ্রাতৃজায়ার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তাহারা নাকি জাতসাপিনীর বংশ, এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণীবন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরানীর নাসাবিবর ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; আবার আর কতকগুলি ঊর্ধ্বমুখ হইয়া আস্ফালন করিতে করিতে মাথার উপর রীতিমত নাগলোকের উৎসব বাধাইয়া দিল; কেবল বেণী নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, শত শেলে বিদ্ধ হইয়া, শত পাক পাকাইয়া নির্জীবভাবে খোঁপা-আকারে ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিল। অবশেষে কখন এক সময়ে দাদা কাঁধের দিকে মাথা নোওয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বৌঠাকুরানীও চুলের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চক্ষু মুদিলেন।

জাহাজ অবিশ্রান্ত চলিতেছে। ঢেউগুলি চারি দিকে লাফাইয়া উঠিতেছে— তাহাদের মধ্যে এক-একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুভ্র ফণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে; গর্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে; স্পর্ধা

করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে— মাথার উপরে স্র্যকিরণ দীপ্তিমান চোখের মতো জ্বলিতেছে— নৌকাগুলাকে কাত করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কী আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে ; মুহূর্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানি দিয়া, আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে। আপিসের ছিপ্‌ছিপে পান্সিগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে ; তাহারা মহৎ মাস্তুলকিরীটী জাহাজের গাম্ভীর্য উপেক্ষা করে, স্টীমারের পিনাকধ্বনিও মান্য করে না, বরঞ্চ বড়ো বড়ো জাহাজের মুখের উপর পাল তুলাইয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া চলিয়া যায় ; জাহাজও তাহাতে বড়ো অপমান জ্ঞান করে না। কিন্তু গাধা-বোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিন ঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মতো ; তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে, তাহারা গায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্ধা অসহ্য বোধ হয়।

এক সময় শুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বরাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। শুনিয়া, আমার ভাজ-ঠাকুরানীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল ; তাঁহার সহসা মনে হইল যে, কাপ্তেন যখন নাই তখন নোঙরের অচল শরণ অবলম্বন করাই শ্রেয়। দাদা বলিলেন, তাহার আবশ্যক নাই, কাপ্তেনের নিচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নহে। কর্তাবাবুরও সেইরূপ মত। বাকি সকলে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে, আর হাঁকডাকেও কাপ্তেনের অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়াছে, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হৃদয়ের ধুক্‌ধুক্ শব্দ বন্ধ হইয়া গেল ; কল চলিতেছে না ; 'নোঙর

ফেলো' 'নোঙর ফেলো' বলিয়া শব্দ উঠিল— নোঙর ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে, সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে। মেরামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়ে-দশটা, দেড়টার পূর্বে মেরামত সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা ছায়া কুটীর— নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুকিয়া আসিয়াছে— জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বাকি কতকগুলি গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুল্‌কুল্ শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর-এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা-ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে; ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল-ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির

ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে ; বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে এবং তাহার রঙ চারি দিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রঙ লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধব্‌ধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে— কেহ ইহার নাতনি, কেহ ইহার মা-মাসি। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরীরাগিণীতে 'গেল গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারিজন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজূটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে ; এক-এক জায়গায় লোকালয়, সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে ; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি, কোনো-কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া— দুই-চারিটি গোরু চরিতেছে ; গ্রামের দুই-একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের খেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের

জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোটো ছোটো জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুঁড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর-এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন ; শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভালো লাগে। তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না, চারি দিকে পোড়ো জায়গা এবড়ো-খেবড়ো, ইতস্তত কতকগুলা ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে, অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো, স্থানে স্থানে মাটি কাটা— এই অনুর্বরতা-বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মতো দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে ; সমুখে ঘাট, নহবত-খানা হইতে নহবত বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে ; প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তকৃতক্ করিতেছে— কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর-এক দিকে তুলসীতলা। সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মতো সন্ধ্যার আভা, সুমধুর বিরাম, নির্বাপিতকলরব

অগাধ শান্তি— সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো, ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মতো, পশ্চিম দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এ দিকে - ও দিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে— পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছল্‌ছল্‌ করিয়া শব্দ হইতে থাকে। আর কিছু ভালো দেখা যায় না, শোনা যায় না— কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ উঠে, আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। আরও রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথ-গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর-খানিকটা আলো পড়ে— সেইটুকু আলোতে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ও পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এ পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারি দিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমন-তরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

মেরামত শেষ হইয়া গেছে; যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর কোলাহল করিয়া নোঙর তোলা হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল। বামে

মুচিখোলার নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা। ডান দিকে শিবপুর বটানিকেল গার্ডেন। যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম গঙ্গা ততই চওড়া হইতে লাগিল। বেলা দুটো-তিনটের সময় ফলমূল সেবন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় কোথায় গিয়া থামা যাইবে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল আসিল; তাহাদের সগর্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল। বাতাস যদিও উল্টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত আমাদের অনুকূল। আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়াছে। জাহাজ বেশ দুলিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি এক-একটা মস্ত ঢেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি— তাহারা জাহাজের পাশে নিষ্ফল রোষে ফেনাইয়া উঠিয়া গর্জন করিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাশ্বাস হইয়া দুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখি কর্তাবাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ রব উঠিল, 'এই এই! রাখ্ রাখ্! থাম্ থাম্!' গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটা লোহার বয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো বয়াটার দিকে চাহিয়া আছি। সে জিনিসটা মহিষের মতো ঢুঁ উদ্যত করিয়া আসিতেছে। অবশেষে ঘা মারিল।

৩

কোথায় সে অবিশ্রাম জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের অহোরাত্র উৎসব, কোথায় সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত নীলিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই অনন্তের দিকে চির-উচ্ছ্বসিত বিচিত্র তরুতরঙ্গ, কোথায় সেই প্রকৃতির শ্যামল স্নেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শিশু লোকালয়গুলি— ঊর্ধ্বে সেই চিরস্থির আকাশের নিম্নে সেই চিরচঞ্চলা স্রোতস্বিনী। চিরস্তব্ধের সহিত চিরকোলাহলময়ের, সর্বত্রসমানের সহিত চিরবিচিত্রের, নির্বিকারের সহিত চিরপরিবর্তনশীলের অবিচ্ছেদ প্রেমের মিলন কোথায়! এখানে সুরকিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে। এখানে চারি দিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, চাপকানের সহিত বোতামের আঁটা-আঁটি মিলন।

পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল— সরে-জমিনে না হউক সরে-জলে বটে— এখন আমরা ডাঙার ধন ডাঙায় ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন সেখানকার কথা এখানে, পূর্বেকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে, সুতরাং এখন যাহা লিখিব তাহার ভুলচুকের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাহ্ন। আমার সমুখে একটা ডেক্‌স্, পাপোশে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে, বারান্দায় শিকলি-বাঁধা একটা বাঁদর লেজের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বসিয়া অকারণ চেঁচাইতেছে এবং এক-একবার খপ্‌ করিয়া বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত এক-চঞ্চু লইয়া ছাতের উপরে উড়িয়া বসিতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হার্মোনিয়ম-বাক্সের মধ্যে গোটাকতক ইঁদুর খট্‌ খট্‌ করিতেছে। কলিকাতা শহরের ইমারতের একটি শুষ্ক কঠিন কামরা, ইহারই মধ্যে

আমি গঙ্গার আবাহন করিতেছি— তপঃক্ষীণ জহ্নুমুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে ঢের বেশি স্থান আছে। আর, স্থানসংকীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখো— বীজের মধ্যে অরণ্য, একটি জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশপরম্পরা। আমি যে ঐ স্টীফেন-সাহেবের এক বোতল ব্লুব্ল্যাক কালী কিনিয়া আনিয়াছি, উহারই প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুষুপ্তি মাদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে। এই কালীর বোতল দৈবক্রমে যদি সুযোগ্য হাতে পড়িত তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতাম, সৃষ্টির পূর্ববর্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল তেমনি ঐ এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নূতন সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে স্টীফেন-সাহেবের কালীর কারখানা সেখানে দাঁড়াইয়া একবার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি, কত চটি, কত যশ, কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান, কত পাগলামি, কত ফাঁসির হুকুম, যুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে। ঐ স্রোত যখন সমস্ত জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে তখন— দূর হউক, কালী যে ক্রমেই গড়াইতে চলিল, স্টীফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাৎ যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে; এবারে ব্লটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে। স্রোত ফিরানো যাক। এসো, এবার গঙ্গার স্রোতে এসো।

সত্য ঘটনায় ও উপন্যাসে প্রভেদ আছে। তাহার সাক্ষ্য দেখো— আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল, তবু ডুবিল না, পরম বীরত্ব-সহকারে কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না, প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না। পাঠকেরা নিশ্চয়ই

অত্যন্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা।

মরিলাম না বটে, কিন্তু যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমত ঢুঁ খাইয়া ফিরিলাম। সুতরাং সেই ঝাঁকানির কথাটা স্মরণফলকে ক্ষোদিত হইয়া রহিল। খানিকক্ষণ অবাক্‌ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা গেল ; সকলেরই মুখে এক ভাব, সকলেই বাক্যব্যয় করা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। বৌঠাকরুন বৃহৎ একটা চৌকির মধ্যে কেমন এক-রকম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুইটি ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক আমার দুই পার্শ্ব জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎক্ষণ ঘন ঘন গোঁফে তা দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্তাবাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, সমস্তই মাঝির দোষ। মাঝি কহিল, তাহার অধীনে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ। সে কহিল, হালের দোষ। হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল, গঙ্গা দ্বিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এইখানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস হইয়া গেল ; সকালবেলায় যেমনতরো মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাত জলের নীচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকেও অতদূর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময় দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাতের উপর পায়চারি করিতে

লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্যকৌতুকের আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বর্ষাকালের দেশালাই-কাঠির মতো সেগুলা ভালো করিয়া জ্বলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি একটু একটু চমক মারিতে লাগিল। যখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রী-সমেত গঙ্গাগর্ভের পঙ্কিল বিশ্রামশয্যায় চতুর্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তখন খবরের কাগজের 'sad accident'এর কোটায় একটিমাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটিমাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিব, সে বিষয়ে নানা কথা অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সংবাদটি এক.চামচ গরম চায়ের সহিত অতিক্ষুদ্র একটি বটিকার মতো কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন, 'আহা কত বড়ো মহদাশয় লোকটাই গেছেন গো— এমন আর হইবে না' এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে বলিবেন, 'আহা, দোষে গুণে জড়িত মানুষটা ছিল, যেমন-তেমন হোক তবু তো ঘরটা জুড়ে ছিল!' ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি বৌঠাকুরানীর চাপা ঠোঁট-জোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আকাশে তারা উঠিল ; দক্ষিনে বাতাস বহিতে লাগিল। খালাসিদের নমাজ পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন খেপা খালাসি তাহার তারের যন্ত্র বাজাইয়া, এক-মাথা কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে। ছাতের উপরে বিছানায় যে যেখানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম ; মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসা-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল, যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্নপক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মতো তা দিতেছে। আমি আর

থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতে লাগিল, মধুরেণ সমাপয়েৎ। যদি এমনই হয়, কোনো সুযোগে যদি একেবারে কুষ্ঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি, যদি জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পরপারের ঘাটে গিয়াই থামে, তবে বাজনা বাজাইয়া দাও— চিত্রগুপ্তের মজলিশে হাঁড়িমুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতো দেখিতে না হই। আর যদি সে জায়গাটা অন্ধকারই হয় তবে এখান হইতে অন্ধকার সঙ্গে করিয়া রানীগঞ্জে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইবার বিড়ম্বনা কেন। তবে বাজাও। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটি সেতারে ঝংকার দিল। ঝিনি ঝিনি ঝিন্ ঝিন্ ইমনকল্যাণ্ বাজিতে লাগিল।

তাহার পরদিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিসেরই অভাব। সেগুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে, কিন্তু যাত্রীদের আবশ্যক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জাম আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছুদিন এইখানেই স্থিতি।

গঙ্গার মাঝে মাঝে এক-একবার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটি প্রধান সৌন্দর্য গতির সৌন্দর্য। চারি দিকে মধুর চঞ্চলতা, জোয়ার-ভাঁটার আনাগোনা, তরঙ্গের উত্থান-পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব— গঙ্গার মাঝখানে একবার স্থির হইয়া না দাঁড়াইলে এ-সব ভালো করিয়া দেখা যায় না। আর জাহাজের হাঁস্‌ফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসিদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মতো দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম আবর্তিত দুই সহস্রবাহু চাকার সরোষ ফেন-উদ্গার— এ-সকল গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যতৎপর অতিসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায়, কিন্তু রসজ্ঞের ইহা সহ্য হয় না। এ যেন

আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান। যেন গঙ্গাযাত্রার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া তোলা। এ যেন মহাভারতের সূচিপত্র গলাধঃকরণ করা।

আমাদের জাহাজ লৌহশৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খরপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনও তরঙ্গসংকুল, কখনও শান্ত; কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক-এক জায়গায় কূল-কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মতো দেখা যাইতেছে। চারি দিকে জেলেডিঙি ও পাল-তোলা নৌকা। বড়ো বড়ো জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুরবন, আমবাগান ও ঝোপ-ঝাপের ভিতরে ভিতরে এক-একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আস্ফালন-পূর্বক একটি বড়ো স্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানবসন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার বেশি পোশাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটীরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।

১২৯১ শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ

নানা কথা

মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে আছে, মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়—তার গন্ধে, তার গানে। অতীত কালের সংখ্যাতীত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উড়িয়ে আছে ; বায়ুমণ্ডলে যেমন তার বাষ্পের উত্তরীয়, এ তেমনি তার চিন্ময় আবরণ ; এর মধ্য দিয়ে মানুষ রঙ পায়, সুর পায় আপন চিরন্তন মনের। তাই যখন শুনি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানু' দেখা যেত, তখন আপনাদের মধ্যে সেই পূর্বপুরুষদের চিত্ত অনুভব করি, তাঁদের সেই মেঘ দেখার সুখ আমাদের সুখের সঙ্গে যুক্ত হয় ; বুঝতে পারি, যাঁরা গেছেন তাঁরাও আছেন।

বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চেয়েছে সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি ছাপ দিয়ে গেছে। বহু দিন থেকে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে, সে গাছে যেমন হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। আমাদের সেই পূর্বপুরুষদের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে প্রতিফলিত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শতসহস্র সঙ্গীর বাস, স্বদেশে আমাদের শতসহস্র বৎসর পরমায়ু।

সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনা দিয়ে থাকে। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর থেকে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনি স্বাভাবিক যে, একবার জাল ছিঁড়লে দেখতে দেখতে আবার শত শত বন্ধন গাঁথতে বসি ; ভুলি, আবার জাল ছিঁড়বেই। নতুন জায়গায় যাই, সেখানে নতুন বন্ধন জড়াতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে, সেখানকার চন্দ্র-সূর্য-তারায়, সেখানকার মানুষে,

সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচার-ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করে দিই; মাঝখানে রাখি আপনাকে। এমনি আমরা মাকড়সার জাতি।

আমরা বদ্ধ না হলে মুক্ত হতে পাই না। ইংরেজিতে যাকে ফ্রীডম বলে তা আমাদের নেই, বাংলায় যাকে স্বাধীনতা বলে তা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাই স্বাধীনতা। সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখম্। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ, আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যার গৃহ নেই তাকে কখনও গাছের তলে, কখনও মাঠে, কখনও খড়ের গাদায়, কখনও দয়াবানের কুটীরে আশ্রয় নিতে হয়; যার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নয়। যে নৌকো হালের অধীন নয় সে কিছুতেই স্বাধীন বলে গর্ব করতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু-হিল্লোলের অধীনতায় দশ দিকে ঘুরে মরতে হবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নেই। অতএব স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নয়; স্বাধীনতার অর্থ কখনও হাল কখনও নোঙরে শৃঙ্খলকে সম্মান করা।

সেদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, নূতন কবির আর প্রয়োজন কী। পুরাতন কবির কবিতা তো বিস্তর আছে। নূতন কথা এমনই কী বলা হচ্ছে। পুরাতন নিয়েই তো কাজ চলে যায়।

নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করে থাকে। পুরাতনের মধ্যেই নূতনের

বাস। নূতন-পুরাতনে বিচ্ছেদ হলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠছে না সেদিন জানব, পুরাতন কবিদের সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়েছে।

নূতন কবিতার ধারা শুষ্ক হলে পুরাতনে পৌঁছবার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ করে রাখছে কে। নূতন কবিতা।

প্রত্যেক বসন্ত পুরাতনকেই পায় নূতন গানে নূতন ফুলে। আমরা বলি নবীন বসন্ত, কিন্তু প্রত্যেক বসন্তই পুরাতন বসন্ত।

ব্যাপ্ত হলে যা অন্ধকার, সংহত হলে তা আলোক; আরও সংহত হলে তা অগ্নি। সংহতিই প্রাণ। সংহত হলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। আমরা জড়োপাসক, শক্তি-উপাসক বলেই বৃহত্ত্বের উপাসনা করে থাকি, বৃহত্ত্বে অভিভূত হয়ে যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পরাশি অপেক্ষা একবিন্দু জল আশ্চর্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌরজগৎ আশ্চর্য। আরম্ভ বৃহৎ, পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্তের মুখ অতি বৃহৎ, আবর্তের শেষ বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরে ঘুরে এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে, বিন্দুত্বের দিকে চলে। কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হয়ে কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জন করতে যায়।

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হতে হয়। আয়তন নিয়ে আমাদের নিরন্তর যুদ্ধ। কার সঙ্গে? দানব কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে, ‘আয়তন আমার। আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দাও।’ অবিশ্রাম লড়াই করে অবশেষে কেড়ে নেয়। শ্মশানক্ষেত্রে তার ডিক্রিজারি।

কিন্তু আমরা জানি, আমরা মৃত্যুকে জিতব। অর্থাৎ দেশকালকে

অতিক্রম করব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনাপতি আছে। সে যুদ্ধ করছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরছে, কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নেই। আমরা সংহতিকে অধিকার করে ব্যাপ্তিকে জিতব। মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মতো চার দিকে ছড়িয়ে আছে। হু হু করে ব্যাপ্ত হয়ে পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ, আমরাও তেমনি স্বভাবতই চার দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি। অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আকর্ষণশক্তি না থাকলে আপন হয়ে আমরা পর হয়ে যাই। আপনাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্তি। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছেড়ে সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই লড়াই করেন। তাঁরা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করবেন। সংকীর্ণতার বলে পরিকীর্ণতা লাভ করবেন।

সংহত দীপশিখা তার আলোকে সমস্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কড়িতে বরগায়, তার উপকরণে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, তখন গৃহই তাকে বদ্ধ করে রাখে,' সে জাগতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হব ততটা অধিকার করব, এর উল্টোটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হবে তুমি ততই অধিকৃত হবে। কিন্তু চার দিক থেকে আপনাকে প্রত্যাহার করে যখন বহ্নিশিখার মতো স্বতন্ত্র দীপ্তি পাবে তখন তোমার সেই তেজস্বী স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারি দিক উজ্জ্বলরূপে অধিকার করতে পারবে।

ভারতবর্ষীয় সাধনার চরম লক্ষ্য সংহতি অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। প্রাণ-শক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করতে পারলে তবেই অন্তরকে বাহিরকে জয় করা যায়।

আমার কোনো বন্ধু লিখেছেন অতীত কাল অমরাবতী। অতীতে অমৃত

আছে। অতীত সংক্ষিপ্তি। বর্তমান কেবল অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্ত, অতীত কালে সেই মুহূর্তরাশি সংহত হয়ে যায়। বর্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। যাকে প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তে দেখি আমরা প্রতি ক্ষণে তার মৃত্যুই দেখতে পাই, যাকে অতীতে দেখি তার অমরতা দেখতে পাই।

যখন গড়তে আরম্ভ করি তখনই প্রতিমা চোখের সম্মুখে জেগে থাকে, যখন শেষ করে ফেলি তখন দেখি তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুদূর লক্ষ্যাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন লক্ষ্যের প্রতি এত টান যে লক্ষ্য যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে লক্ষ্য আর মনে পড়ে না। যাকে আশা করি তাকে যতখানি পাই, আশা পূর্ণ হলে তাকে আর ততখানি পাই নে। অর্থাৎ, চাইলে যতখানি পাই পেলে ততখানি পাই নে।

আসল কথা শেষ মানুষের হাতে নেই। 'শেষ হল' বলে যে আমরা দুঃখ করি তার অর্থ এই— শেষ হয় নি, তবুও শেষ হল; আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, অথচ চেষ্টার অবসান হল। এইজন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ, মানুষের সমাপ্তির অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১২৯২ জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র

ছোটোনাগপুর

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায়-ঘুমে স্বপ্নে-জাগরণে খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে স্টেশনের নাম হাঁকা ; আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানালায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকারেখা দেখা যায় ; সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক-একটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল ; যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে ; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে, কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না— আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখো, পাথরের মতো কালো ঝাঁকড়া-চুলের-ঝুঁটি-বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল জোড়া, এখনও চাষ আরম্ভ হয় নাই, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার, তক্‌তক্‌ করিতেছে, মাঝখানে

একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারি দিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। পাৎলা লম্বা শুকনো সাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকা চুলের মতো। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক-একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া। মাঝে মাঝে এক-একটা অশথগাছ, আমগাছও দেখা যায়। শুষ্ক ক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটিরের চালশূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে তাকাইয়া আছে। কাছে একটা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধি স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেলগাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। এ'কে কি আর গাড়ি বলে। চারটে চাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা।

সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাংলার যত দূরে চাই ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকতক গাছ। চারি দিকে যেন রাঙা মাটির ঢেউ। একটা রোগা টাট্টু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারি দিকে চাহিয়া কী যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। কোনো কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুলকাই-তেছে। আর-একটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ্-পদার্থ পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেসৃষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্‌গড়্ করিয়া দ্রুতবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড়

দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া ; এই পাহাড়-গুলাকে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ, যেন ভীষ্মের শরশয্যা। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হুঁচট খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল 'বড়াকর নদী'। টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া, আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে চার-পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি, চারি দিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই, চারি দিকে উঁচুনিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মতো ধূধূ করিতেছে। দিক্‌-দিগন্তরের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্‌-এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া আছে।

দূর হইতে উপছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি, বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা গাছ। তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারি দিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। সুদূর-বিস্তৃত মাঠ। দূরে গোরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো ছোটো ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গোরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ শহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। শাহরিক ভাব বড়ো নাই। গলিঘুঁজি, আবর্জনা, নর্দামা, ঘেঁষাঘেঁষি, গোলমাল, গাড়িঘোড়া, ধুলোকাদা, মাছিমশা, এ-সকলের প্রাদুর্ভাব বড়ো নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে শহরটি তক্‌তক্‌ করিতেছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুরবেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ সাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো-মেঠো ঘেসো-ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুইটা শালিখ বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়া গোরু লইয়া যাইতেছে, তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ শুনিতেছি।

লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া, কেউ কাঁধে মোট লইয়া, কেউ দু-একটা গোরু তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোটো টাট্টুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরে-সুস্থে চলিতেছে ; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয়, এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মতো হাঁস্‌ফাঁস্ করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গোরুর গাড়ির চাকার মতো আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল্‌কুল্ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সমুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে, তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হা হা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারি দিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি তখন এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে, শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতি ঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে, 'আর কেহ জাগুক না-জাগুক, আমি জাগিয়া আছি।' কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

১২৯২ আষাঢ়

রুদ্ধ গৃহ

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে, তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না— এমন কতদিন হইতে কে জানে।

সে ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। যেখানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কয় না, সেই-খানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনো হয় সেই পবিত্র স্থানে ভয় আর আসিতে পারে না।

দুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ ঘরের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধি-ভবন কৃপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে ; পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই-বোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা

দেখিলে, আমাদের কোনো ভয় থাকে না ; কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু, রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে এক তালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে ; সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে। কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এইজন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য-ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায় ; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন। হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন। তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও ; জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেইদিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্তা অন্তরে পৌঁছায় না, অন্তরের নিশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যখন পূর্ণিমার

চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে তখন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কিনা কে বলিতে পারে। পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না। এ ঘর কী ভাবে চাহে, কী ভাবে শোনে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে একদিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে-সকল স্নেহপ্রেমের লীলা হইয়া গেছে সেই স্নেহপ্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে; এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সংসার-ক্ষেত্রের জন্য সে কাঁদে।

তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিও না, দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্যের আলো দেখিয়া, মানুষের সাড়া পাইয়া, চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু, পবিত্র সমীরণের মতো ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক

পথপ্রান্তে

আমি পথের ধারে বসিয়া লিখি, তাই কী লিখি ভাবিয়া পাই না।

ছায়াময় পথ। প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। ভোরের বেলায় সূর্যের প্রথম কিরণ অশোকশাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাকে দেখে, আমার কোলের উপর পড়িয়া খেলা করে, আমার লেখার উপর আসিয়া পড়ে, এবং যখন চলিয়া যায় তখন লেখার উপরে খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়; আমার লেখার উপরে তাহার কনকচুম্বনের চিহ্ন থাকিয়া যায়। আমার লেখার চারি ধারে প্রভাত ফুটিয়া উঠে। মাঠের ফুল, মেঘের রঙ, ভোরের বাতাস এবং একটুখানি ঘুমের ঘোর আমার পাতার মধ্যে মিশাইয়া থাকে; অরুণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারি দিকে লতাইয়া উঠে।

আমার সমুখ দিয়া কত লোক আসে, কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদের আশীর্বাদ করিতেছে, স্নেহভরে বলিতেছে 'তোমাদের যাত্রা শুভ হউক'। পাখিরা কল্যাণগান করিতেছে, পথের আশে-পাশে ফুট'-ফুট' ফুলেরা আশার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে। যাত্রা-আরম্ভের সময়ে সকলে বলিতেছে, 'ভয় নাই, ভয় নাই।' প্রভাতে সমস্ত বিশ্বজগৎ শুভযাত্রার গান গাহিতেছে। অনন্ত নীলিমার উপর দিয়া সূর্যের জ্যোতির্ময় রথ ছুটিতেছে। নিখিল চরাচর যেন এইমাত্র বিশ্বেশ্বরের জয়ধ্বনি করিয়া বাহির হইল। সহাস্য প্রভাত আকাশে বাহু বিস্তার করিয়া আছে, অনন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জগৎকে পথ দেখাইয়া দিতেছে। প্রভাত জগতের আশা, আশ্বাস, প্রতিদিবসের নান্দী। প্রতিদিন সে পূর্বের কনকদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জগতে স্বর্গ হইতে মঙ্গলবার্তা আনিয়া দেয়, সমস্ত দিনের মতো অমৃত আহরণ করিয়া

আনে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দনের পারিজাতের গন্ধ আসিয়া পৃথিবীর ফুলের গন্ধ জাগাইয়া তোলে। প্রভাত জগতের যাত্রা-আরম্ভের আশীর্বাদ —সে আশীর্বাদ মিথ্যা নহে।

আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা সুখ দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতি নিমেষের ভার ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসিকান্না আমার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্রেম তাহারা রাখিয়া যায়।

আর-কিছুই থাকে না, কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহারা সমস্ত পথ কেবল ভালো বাসিতে বাসিতে চলে। পথের যেখানেই তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালোবাসে। সেইখানেই তাহারা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চায়; তাহাদের বিদায়ের অশ্রুজলে সে-জায়গাটুকু উর্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথের দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল, নূতন নূতন তারা ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিকদিগকে তাহারা ভালো বাসিতে বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে তাহারা চলিয়া যায়, প্রেমের প্রভাবে তাহাদের প্রতি পদক্ষেপের শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। জননীর স্নেহের ন্যায় জগতের শোভা সমস্ত পথ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে, হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃপুর হইতে তাহাদিগকে বাহিরে ডাকিয়া আনে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়া যায়।

প্রেম যদি কেহ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত, তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের যদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিহ্নের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর-সমস্ত

বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়। বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে, নইলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

পথিকেরা যখন চলে আমি বাতায়ন হইতে তাহাদের হাসি দেখি, কান্না শুনি। যে প্রেম কাঁদায় সেই প্রেমই আবার চোখের জল মুছাইয়া দেয়, হাসির আলো ফুটাইয়া তোলে। হাসিতে অশ্রুতে, আলোতে বৃষ্টিতে আমাদের চারি দিকে সৌন্দর্যের উপবন প্রফুল্ল করিয়া রাখে। প্রেম কাহাকেও চিরদিন কাঁদিতে দেয় না। যে প্রেম একের বিরহে তোমাকে কাঁদায় সেই প্রেমই আর-পাঁচকে তোমার কাছে আনিয়া দেয়। প্রেম বলে, 'একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখো, যে গেছে ইহারা তাহার অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে।' কিন্তু তুমি অশ্রুজলে অন্ধ, তুমি আর কাহাকেও দেখিতে পাও না, তাই ভালোবাসিতে পার না। তুমি তখন মরিতে চাও, সংসারের কাজ করিতে পার না। তুমি পিছন ফিরিয়া বসিয়া থাক, জগতে যাত্রা করিতে চাও না। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়, প্রেম তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি মৃত্যুর উপরে মুখ গুঁজিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পার না।

প্রভাতে যাহারা প্রফুল্লহৃদয়ে যাত্রা করিয়া বাহির হয় তাহাদিগকে অনেক দূরে যাইতে হইবে। অনেক অনেক দূর। পথের উপরে যদি তাহাদের ভালোবাসা না থাকিত তবে তাহারা এ দীর্ঘ পথ চলিতে পারিত না। পথ ভালোবাসে বলিয়াই প্রতি পদক্ষেপেই তাহাদের তৃপ্তি। এই পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলে, আবার এই পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলিতে চাহে না। তাহারা পা উঠাইতে চাহে না। প্রতি পদে তাহাদের ভ্রম হয়, 'যেমন পাইয়াছি এমন আর পাইব না।' কিন্তু অগ্রসর হইয়াই আবার সমস্ত ভুলিয়া যায়। প্রতি পদে তাহারা শোক মুছিয়া মুছিয়া চলে। তাহারা আগেভাগে আশঙ্কা করিয়া বসে

বলিয়াই কাঁদে, নহিলে কাঁদিবার কোনো কারণ নাই।

ঐ দেখো, কচি ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। ঐ ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে। ঐ ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রেমের প্রভাবে পথের কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠিতেছে। ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মতো মধুর করিয়াছে কে। কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন। মা কেন মনে করে, এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান। অনন্তের পথে যেখানে পৃথিবীর সকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়— সেখানে শতকোটি সন্তান। সেখানে বিশ্বের কচি মুখগুলি ফুটিয়া একেবারে নন্দনবন করিয়া রাখিয়াছে। আকাশের চাঁদকে কাড়াকাড়ি করিয়া লইবার জন্য কী আগ্রহ। সেখানে স্খলিত মধুর ভাষার কল্লোল। আবার ও দিকে শোনো— সুকুমার অসহায়েরা কী কান্নাই কাঁদিতেছে। শিশুদেহে রোগ প্রবেশ করিয়া ফুলের পাপড়ির মতো কোমল তনুগুলি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কোমল কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইতেছে না; ক্ষীণস্বরে কাঁদিতে চেষ্টা করিতেছে, কান্না কণ্ঠের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। আর, ঐ শিশুদের প্রতি বর্বর বয়স্কদের কত অত্যাচার।

একটি ছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া দেয়। যার ছেলে নাই তার কাছে অনন্ত স্বর্গের একটা দ্বার রুদ্ধ; ছেলেটি আসিয়া স্বর্গের সেই দ্বারটি খুলিয়া দেয়; তার পর তুমি চলিয়া যাও, সেও চলিয়া যাক। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্য কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর-একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্যই তাহাকে পথের আলো বলি। সে যদি আলেয়ার আলো হইত, তবে সে পথ ভুলাইয়া, ঘাড় ভাঙিয়া, তোমাকে যা-হোক একটা-

৩

কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিত ; আর-সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিত, সেই একটা-কিছুর মধ্যে পড়িয়াই তোমার অনন্তযাত্রার অবসান হইত— অন্য পথিকেরা তোমাকে মৃত বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেটি হইবার জো নাই। একটিকে ভালোবাসিলেই আর-একটিকে ভালোবাসিতে শিখিবে। অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

পথ দেখাইবার জন্য সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ আসে নাই। এইজন্য কেহই ভিড় করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ করিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর-কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি নিজের চারি দিকে দেয়াল গাঁথিয়া তোলে, কালের প্রবাহ ক্রমাগত আঘাত করিয়া তাহার সে দেয়াল এক-দিন ভাঙিয়া দেয়, তাহাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দেয়। তখন সে আবরণের অভাবে হি হি করিয়া কাঁপিতে থাকে, হায়-হায় করিয়া কাঁদিয়া মরে। জগৎকে দ্বিধা হইতে বলে। ধূলির মধ্যে আচ্ছন্ন হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি ; অনন্ত শক্তিমান যদি এই অনন্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে কেবলমাত্র বলপূর্বক লইয়া যাইতেন, প্রচণ্ড অদৃষ্ট যদি আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত, তবে আমরা দুর্বলেরা কী করিতে পারিতাম। কিন্তু যাত্রার আরম্ভে শাসনের বজ্রধ্বনি শুনিতেছি না, প্রভাতের আশ্বাসবাণী শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে, দুঃখ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালোবাসিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে আমরা গ্রাহ্য করি না বটে, কিন্তু ভালোবাসা সহস্র দিক হইতে তাহার বাহু বাড়াইয়া আছে। সেই অবিশ্রাম ভালোবাসার আহ্বানই আমরা যেন

শিরোধার্য করিয়া চলিতে শিখি, মোহে জড়াইয়া না পড়ি, অবশেষে অমোঘ শাসন আসিয়া আমাদিগকে যেন শৃঙ্খলে বাঁধিয়া না লইয়া যায়।

আমি এই সহস্র লোকের বিলাপ ও আনন্দ -ধ্বনির ধারে বসিয়া আছি। আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, ভালোবাসিতেছি। আমি পথিক-দিগকে বলিতেছি, 'তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম তোমাদিগকে পাথেয়স্বরূপে দিতেছি।' কারণ, পথ চলিতে আর-কিছুর আবশ্যক নাই, কেবল প্রেমের আবশ্যক। সকলে যেন সকলকে সেই প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

১২৯২ অগ্রহায়ণ

লাইব্রেরি

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক-একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থানপতনের শব্দ শুনিতেছ। এখানে জীবিত ও

মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে! বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে; সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘপ্রাণ স্বল্পপ্রাণ পরম ধৈর্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে— কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো, এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসংগীত গান হইতেছে।

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারি দিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ' সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই। মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই। জগতের একতান সংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না। আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না। আমাদের মাথার উপরে কি তবে অনন্ত নীলাকাশ নাই। সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

দেশ-বিদেশ হইতে অতীত-বর্তমান হইতে, প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে; আমরা কি তাহার উত্তরে দুটি-চারটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব। সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে। বাঙালির নাম কি কেবল

দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে। জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউ-কুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপিল চালাইতে থাকিব।

বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসংগীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

১২৯২ পৌষ

নববর্ষা

যৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসারেরও অন্ত ছিল না। আমি কী যে হইব, না হইব, কী করিতে পারি, না পারি, কাজে ভাবে অনুভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদূর, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই ; সংসারও অনির্দিষ্ট রহস্যপূর্ণ ছিল ; এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি ; পৃথিবীও সেই সঙ্গে সংকুচিত হইয়া গেছে। এখন ইহা আমারই আপিসঘর বৈঠকখানা দরদালানের শামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যস্ত পরিচিত হইয়াছে যে ভুলিয়া গেছি, এমন কত আপিসঘর বৈঠকখানা দরদালান ছায়ার মতো এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেল, ইহাতে চিহ্নও রাখিতে পারিল না। কত প্রৌঢ় নিজের মামলা-মকদ্দমার মন্ত্র-গৃহকেই পৃথিবীর ধ্রুব কেন্দ্রস্থল গণ্য করিয়া তাকিয়ার উপর ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল ; তাহাদের নাম তাহাদের ভস্মের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই— তবু পৃথিবী সমান বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বৎসর যখনই আসে তখনই আপন নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না ; কারণ, সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সংকোচের সঙ্গে সে সংকুচিত হয় না। যখন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শত্রুর দ্বারা পীড়িত, দুরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যে কেবল হৃদয়ের মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নহে, যে পৃথিবী আমার চারি দিকে স্থির প্রতিষ্ঠিত, আমার আঘাতের দাগ তাহার উপরে পড়িয়াছে। তাহার জলস্থল আমার বেদনায় বিক্ষত, আমার দুশ্চিন্তায় চিহ্নিত। আমার উপর যখন অস্ত্র আসিয়া পড়িয়াছে তখন আমার চারি দিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ায়

নাই, শর আমাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এমনি করিয়া বারংবার আমার সুখদুঃখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেছে।

মেঘে আমার কোনো চিহ্ন নাই। সে পথিক আসে যায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশা-নৈরাশ্য হইতে সে বহু দূরে।

এইজন্য কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন আমরাও সেই মেঘ দেখিতেছি। ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী, সে বিদিশা কোথায়। মেঘদূতের মেঘ প্রতি বৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়; বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে, সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ, সুখী লোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজন্যই। মেঘ মনুষ্যলোকের কোনো ধার ধারে না বলিয়া মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা চেষ্টা কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে-নির্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ সংসারের সম্বন্ধ। মেঘ সংসারের এই-সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনই হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে; একটা বহু দূর কালের এবং বহু দূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে; তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ কথা

আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জ্ঞানে জানে মাত্র ; সে নিয়ম যে এখনও বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম— ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি ; আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশ্যক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোনো রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি ; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে ; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিসের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে ; জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি ; যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্মক্ষেত্রকে, নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া সজলমেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়, পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর

বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে ; আমাকে রামগিরি-আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গীহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জন শিখর এবং আমার কোন্‌-এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান, অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ-সুন্দর পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে ; নদীকল-ধ্বনিত, সানুমৎপর্বতবন্ধুর, জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার, নববারিসিঞ্চিতযূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, শৃঙ্গে শৃঙ্গে, নদীর কূলে কূলে, ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্বমেঘে বৃহৎ পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্‌ঘাটিত। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষে অর্ধনিমীলিতলোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ির বহু দূরে যে আবর্তচঞ্চলা নর্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নবনীপে বিকশিত উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্যবট শুককাকলিতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিরসত্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভমেঘচ্ছায়াবৃত নগনদীনগরজনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাঁহার মুগ্ধ নয়নকে

অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়াছে তিনি তাহাকে আর 'না' বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্যে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর ; সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যস্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায় ; পূর্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্‌বেল করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন, আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম্', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই ; সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীর-দ্বারা কল্পনা কোনোখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ তেমনি সেই পৃথিবী। আমার এই সুখদুঃখ ক্লান্তি অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রৌঢ়বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া, ঘের দিয়া, তাহাকে নিজের বাস্তবাগানের অন্তর্‌ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্বমেঘ। নব-মেঘের আর-একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারি দিকে একটি পরমনিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া 'জননান্তরসৌহৃদানি' মনে করাইয়া দেয়, অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে কোন্-একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।

পূর্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয়, এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা এবং স্বর্গলোক একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়িয়া আছি। মেঘ

আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্বমেঘের গান; এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া, সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই— যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই— তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা-কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি— পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্য গহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এইজন্য কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি— তাঁহার পূর্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

১৩০৮ শ্রাবণ

কেকাধ্বনি

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন 'আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না ; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন বুঝিবার জো নাই।'

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা, দুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি-বা কৈবল্যদশা-প্রাপ্তি হইয়াছে— তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লির ঝংকারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্ঋতুর মহাসংগীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

এক প্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া মন তাহার সৌন্দর্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে, ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া ; এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে, বলে— ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলই মিষ্ট। অর্থাৎ, উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোনো প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজদার এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্টগায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসার দ্বারা অপমানিত করে, মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে

না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না ; সে বলে, ‘আমাকে শুকনো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব।’ গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, ‘বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইয়ো না ; আমাকে শুকনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুশি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব।’ বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিসের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, ‘আর কেন, ঢের হইয়াছে।’

এইজন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিককার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ, সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে ; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে তাহা সে বোঝে ; এইজন্যই তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে ; অথচ তখনও সে তাহার সীমা পায় না, এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজদারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করে ; অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্বপ্রকার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, ‘তুমি কী বুঝিবে !’ আর-এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, ‘যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর-কেহ বুঝি বোঝে না !’

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্য-সাধনের আনন্দ— এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে,

না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট্ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে, ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর তাহা আপাতত বহু লোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে, তাহার মধ্যে যে-একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। 'ললিতলবঙ্গলতা'র পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা, ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থানপতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে— তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া যায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুশি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে-একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও

আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, সে সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, মনে হয় যেন কান জুড়াইয়া গেল– কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে সময়বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতরঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্ধ্ববাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে-একটি কাংস্যক্রেংকারধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান; কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে; সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না— তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম

প্রাথমিক ভাব আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল-আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্পপল্লবেরই মতো প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেইজন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী সুরে বাজিতে থাকে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি বুঝিয়াছেন জগতে ঋতু-আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো; ফুল-ফোটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্ত ভাবের সঙ্গে নহে, ঘন বর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোনো বর্ণবৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই; শচীর কোনো প্রাচীন কিংকরী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসরবর্ণ। নানাশস্যবিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপী কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই।

মাঠে বহুদিন পূর্বে খেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতির্হীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মতো, নিস্তব্ধ নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডীকে আরও ঘন করিয়া চারি দিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেয়ে! তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লিরব ভালোরূপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লিরবও আর-একটা আচ্ছাদন বিশেষ— তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ, তাহা বর্ষানিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

১৩০৮ ভাদ্র

বাজে কথা

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম-অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গোযান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্তন করা যাইতে পারে। আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্বজনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন; কিন্তু তখনই তাঁহার বিপদ যখনই তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনো কথাই বলিতে পারে না, হয় বেদবাক্য বলে নয় চুপ করিয়া থাকে, হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য, তাহার প্রতিবেশ, শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

পৃথিবীতে জিনিসমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝক্‌ঝক্ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান।

এক-একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মতো অকারণ ঝল্‌মল্ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে— তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো

বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারও থাকে না ; সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ প্রকাশ এত ভালোবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও, উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কী আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে দুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোনো লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইঁহাদিগকে যে-সকল নামে অভিহিত করিয়াছে আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত। আমরা ইঁহাদিগকে যাহা মনে করি তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সামলাইয়া কথা কহিতেন না, তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃত শ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে— সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়া ছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল, যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র, তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে

প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্বরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন; কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসী দিগকে উদ্‌বেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃতসাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায় ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন তবে তখনই ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী; কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘ-নির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীহৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিত বেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে— আর-কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন যে idle tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তখন

মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছ কেন। আমি তর্ক করিতে চাই না, এ সকল কথার আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও-সমস্তই কালিদাসের বানানো, কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষমাত্র। ঐ ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন ; এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন ; আষাঢ়ের প্রথম দিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক স্বষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এত রহিয়া বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কৃষ্ণকটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়েও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয়, তবে স্বীকার করিব, মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনও মানুষ ছিল এবং তখনও আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন। ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে। অতএব যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক— যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না।

১৩০৯ আশ্বিন

মা ভৈঃ

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোটো-বড়ো-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যেসব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস-মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে ; যাহার প্রাণ আছে তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয় সেই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই ; যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না ; তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা কৃশতা ঘৃণ্যতা, গাড়িজুড়ি এবং তক্‌মা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে— এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর-এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা জীবনের সুখকে আগ্রহ্য করিতে পারে তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব এ কথা বলা যেমন শক্ত, সুখটা চাই না এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই তবে এ দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই', নয় বীর্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই না'। 'চাই' বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই— 'চাই না' বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই— এমন ধিক্কার বহন করিয়াও তাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুশকিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্তা যতই বড়ো হোক, কাহারও কাছে সে খাতির দাবি করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর লাগে। না মরিলে সেটা সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালো মন্দ কোনো-একটার অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন। তাঁহারা যদি মরিতেন তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা নিজেদের মরিবার শক্তি সম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সংগতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সংগতি রাখিয়া যান নাই। এত বড়ো দুর্ভাগ্য, এত বড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে।

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধজাতিকে ডাকিয়া বলেন, 'তোমরা

লড়াই করিয়াছ, প্রাণ দিতে জান ; যাহারা কখনও লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস করিতে যাইবে।'

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাই। সেইজন্য যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না ; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসংগত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অথচ যখন ভাবিয়া দেখি আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহ-মরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয় মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোনো দেশেই লোক নির্বিশেষে নির্ভয়ে ও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে ; বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় না। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলে তাহারা অনায়াসে অকপটে স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিথ্যা গর্ব করিতে হয় তবে, আমার সাহস আছে এই মিথ্যা গর্বই সবচেয়ে মার্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বল, অজ্ঞতাই বল, মূঢ়তাই বল, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মতো এত ছোটো আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহংকারও করে, অন্তত তাহার লজ্জা আছে, এই সদ্-

গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই সেখানে এই লজ্জার চর্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণ বিসর্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়।

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল— লজ্জায় হউক, প্রেমে হউক, ধর্মোৎসাহে হউক, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত, দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন্য দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব-দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে, দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ; চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি-দ্বারা পূত হইয়াছে, আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয় অমর স্মরণ-নিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত

পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত বাহু-রূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরবস্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভয়ঘোষণা করুক।

১৯০৯ কার্তিক

পরনিন্দা

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, এ কথা শিশুও জানে; কিন্তু যখন দেখি সাত সমুদ্রের জল নুনে পরিপূর্ণ, যখন দেখি এই নোনা জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন এ কথা বলিতে কোনোমতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে নুন না থাকিলেই ভালো হইত। নিশ্চয়ই ভালো হইত না, হয়তো লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।

তেমনি, পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত তবে নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মতো সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

পাঠক বলিবেন, 'বুঝিয়াছি। তুমি যাহা বলিতে চাও তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ নিন্দার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।'

এ কথা যদি পুরাতন হয় তবে আনন্দের বিষয়। আমি তো বলিয়াছি যাহা পুরাতন তাহা বিশ্বাসের যোগ্য।

বস্তুত, নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কী থাকিত। একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না— সে ভালো কাজের দাম কী! একটা ভালো কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই— ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্মান্তিক অনাদর কী হইতে পারে! জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোনো লোক তাহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল।

মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্‌গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে

সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

নিন্দা-বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকেই বলিতে পারে। কোনো সহৃদয় লোক তো বলিতে পারে না। যাহার হৃদয় বেশি তাহার ব্যথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হৃদয় আছে সংসারে সেই লোকই কাজের মতো কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মতো লোক দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন, সেইখানেই দুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক। নিন্দা দুঃখ বিরোধ যেন ভালো লোকের, গুণী লোকের ভাগ্যেই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে সেই যেন ব্যথা পায়। অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দাবেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয়।

সরলহৃদয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন, 'জানি নিন্দায় উপকার আছে। যে লোক দোষ করে তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভালো, কিন্তু যে করে না তাহার নিন্দায় সংসারে ভালো হইতেই পারে না। মিথ্যা জিনিসটা কোনো অবস্থাতেই ভালো নয়।'

এ হইলে তো নিন্দা টিঁকে না। প্রমাণ লইয়া দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে তো হইল বিচার। সে গুরুভার কয়জন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে। তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাহারও গরজ নাই। যদি থাকিত তবে পরের পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ্য হইত। নিন্দুককে সহ্য করা যায়, কারণ, তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার সুখ আমারও হাতে আছে, কিন্তু বিচারককে সহ্য করিবে কে।

বস্তুত, আমরা অতি সামান্য প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি। নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইত। নিন্দার

রায় চূড়ান্ত রায় নহে ; নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন-কি, নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত, তবে সুবুদ্ধিকে উকিল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। যাঁহারা জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকিল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজন হিসাবে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব আবশ্যক তাহাও আছে, যতটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারও অভাব নাই।

পূর্বে যে পাঠকটি আমার কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, 'তুচ্ছ অনুমানের উপরেই হউক বা নিশ্চিত প্রমাণের উপরেই হউক, নিন্দা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত, নিন্দায় সুখ পাওয়া উচিত নহে।'

এমন কথা যিনি বলিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত— নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পায়, আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে তবে সংসারে দুঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে। তাহা হইলে নিমন্ত্রণসভা নিস্তব্ধ, বন্ধুসভা বিষাদে ম্রিয়মাণ, সমালোচকের চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্গহ্বর হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘনঘন উচ্ছ্বসিত হইত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়।

তা ছাড়া, সুখও পাইব না অথচ নিন্দাও করিব, এমন ভয়ংকর নিন্দুক মনুষ্যজাতিও নহে। মানুষকে বিধাতা এতই শৌখিন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছে, তখনও ক্ষুধানিবৃত্তি ও রুচিপরিতৃপ্তির যে সুখ সেটুকুও তাহার চাই— সেই মানুষ ট্রাম ভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ি গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আসিবে, অথচ তাহাতে সুখ পাইবে না, যে ধর্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্তু পালনীয় নহে।

আবিষ্কারমাত্রেরই মধ্যে সুখের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র সুখের হইত না, যদি মৃগ যেখানে সেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পলাইয়া না যাইত। মৃগের উপরে আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই যে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং সে পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পায়ের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এইজন্যই নিন্দার এত সুখ। 'আমি নাড়ীনক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই' নিন্দুকের মুখে এ কথা শুনিলেই বোঝা যায়, সে ব্যক্তি জাত-শিকারী। তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না আমি সেইটাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি, আকাশের পাখিকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি— ইহা কত সুখের। যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা ইহার জন্যে মানুষ কী না করে।

দুর্লভতার প্রতি মানুষের একটা মোহ আছে। সে মনে করে যাহা সুলভ তাহা খাঁটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণমাত্র, যাহা লুকাইয়া আছে তাহাই আসল। এইজন্যই গোপনের পরিচয় পাইলে সে আর কিছু বিচার না করিয়া 'প্রকৃতের পরিচয় পাইলাম' বলিয়া হঠাৎ খুশি হইয়া উঠে। এ কথা সে মনে করে না যে, উপরের সত্যের চেয়ে নীচের সত্য যে বেশি সত্য তাহা নহে ; এ কথা তাহাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তবুও তাহা সত্য, এবং ভিতরে যেটা সেটা যদি সত্য না হয় তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্য অপেক্ষা তাহার গভীর তত্ত্বকে পাঠক অধিক সত্য বলিয়া মনে করিতে ভালোবাসে, এবং বিজ্ঞ লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোকচর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব করে।

এইজন্য মানুষের নিন্দা শুনিলেই মনে হয়, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আমাকে ঘরকন্না করিতে হয়, অথচ এত-শত লোকের প্রকৃত পরিচয় লইয়া আমার লাভটা কী। কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ের জন্য ব্যগ্রতা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, সেটা মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ— অতএব তাহার সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। কেবল যখন দুঃখ করিবার দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায় তখন এই ভাবি যে, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা ফুলের মতো বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আসে বলিয়াই বুদ্ধিমান মানুষ ঠকিবার ভয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস করে নাই। ঠকাই কি সংসারে চরম ঠকা। না-ঠকাই কি চরম লাভ।

কিন্তু, এ-সকল বিষয়ের ভার আমার উপরে নাই; মনুষ্যচরিত্র আমি জন্মিবার বহু পূর্বেই তৈরি হইয়া গেছে। কেবল এই কথাটা আমি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম যে, সাধারণত মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায় তাহা বিদ্বেষের সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনোই সাধারণভাবে সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভালোলোক নিরীহলোককেও নিন্দা করিতে শুনিয়াছি, তাহার কারণ এমন নহে যে, সংসারে ভালোলোক নিরীহলোক নাই; তাহার কারণ এই যে, সাধারণত নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দভাব নয়।

কিন্তু, বিদ্বেষমূলক নিন্দা সংসারে একেবারে নাই, এ কথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে নিন্দা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি।

১৩০৯ অগ্রহায়ণ

রঙ্গমঞ্চ

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত সে সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়; রাগিণী হিসাবে সে বেচারার কোনো কালে পদোন্নতি ঘটে না। যাহা উচ্চ দরের কাব্য তাহা আপনার সংগীত আপনার নিয়মেই যোগাইয়া থাকে, বাহিরের সংগীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সংগীত তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে, তাহা কথার জন্য কালিদাস মিল্‌টনের মুখাপেক্ষা করে না— তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম্‌-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে গানেতে কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে; কিন্তু সে কতকটা খেলা হিসাবে, তাহা হাটের জিনিস, তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্য সে বিশেষভাবে সৃষ্ট। সে যে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ কথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারও

অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি ; সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ কথা বলিতে পার যে, অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা, নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানা দিকে খর্ব করে তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, 'আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল— আমার কোনোই ক্ষতি নাই।'

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কী কথা আছে। যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে যেটুকু অধীনতা তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্তই না হইলে নয়, সেইটুকু সে যেন গ্রহণ করে, তাহার বেশি সে যাহা-কিছু অবলম্বন করে তাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি যোগান তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয় ; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন। তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না ; তাহা আঁকা মাত্র ; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া

তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।

তা ছাড়া, যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানা কড়াও নাই। সে কি শিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়ে নির্ভর করিবার জো নাই। যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল্‌ দাম দিলেও এমন-সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই।

এ তো আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য, আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন। তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবিবন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপসের সম্বন্ধ।

দুষ্যন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও। আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি, এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে; দুষ্যন্ত শকুন্তলা অনসূয়া প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত— সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্তমান দেখিতে পাই তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়; কিন্তু দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই।

পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারি দিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে। একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে।

শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ-ছোটানো বন্ধ করিতেন। অবশ্য তিনি বড়ো কবি, রথ বন্ধ হইলেই যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত তাহা নহে ; কিন্তু আমি বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাহার জন্য, যাহা বড়ো তাহা কেন নিজেকে কোনো অংশে খর্ব করিতে যাইবে। ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল ; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

অতএব যখন দুষ্যন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয় ; অতএব কাব্যের খাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য ত্রুটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান করিয়া তোলেন। কিন্তু মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাটো হইতে হইত, তবে

ঐ কয়েকটা হতভাগ্য কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত।

শকুন্তলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কণ্বাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্য সে আর কাহারও উপর কোনো বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কী চরিত্রসৃজনে, কী স্বভাবচিত্রে, নিজের কাব্যসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্যন্ত চাই। এখন কলিযুগ, সুতরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই। তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের স্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়া-কর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ। কলাপাতায় আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া, ভোজের যাহা প্রকৃততম আনন্দ, অর্থাৎ বিশ্বকে অবারিতভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা, সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত তবে আসল জিনিসটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য ; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার

চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলে-মানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারি দিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়; বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলা-পোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে, এবং যেখানে অজীর্ণবশত যথার্থ রসের ক্ষুধার অভাব সেখানে বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য ক্রমশই ভীষণরূপে বাড়িয়া চলে— অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া চাটনিই স্তূপাকার হইয়া উঠে।

১৩০৯ পৌষ

পনেরো-আনা

যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড়ো হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশ্যক ; বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিঙ আছে তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো-আনা অনাবশ্যকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ূরের লেজ যে কেবল রঙচঙে জিতিয়াছে তাহা নহে, তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিক খঞ্জন ফিঙার পুচ্ছ লজ্জায় অহরহ অস্থির।

যে মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না ; যদি করিত তবে মনুষ্যসমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া উঠিত যাহার বীচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই। কেবলই যে লোক উপকার করে তাহাকে ভালো না বলিয়া থাকিবার জো নাই ; কিন্তু যে লোকটা বাহুল্য, মানুষ তাঁহাকে ভালোবাসে।

কারণ, বাহুল্যমানুষটি সর্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে। পৃথিবীর উপকারী মানুষ কেবল উপকারের সংকীর্ণ দিক দিয়াই আমাদের একটা অংশকে স্পর্শ করে ; সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের দ্বারা আর-সকল দিকেই ঘেরা, কেবল একটি দরজা খোলা, সেখানে আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্যলোকটি কোনো কাজের নহে, তাই তাহার কোনো প্রাচীর নাই। সে আমাদের সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গীমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জন করিয়া আনি, এবং বাহুল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী সেই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিঙ ও ময়ূরের পুচ্ছের মতো সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্তি গড়িবার নিষ্ফল চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অল্প লোকই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্য পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। ট্রেনের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ্‌-গাড়ি হইত, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কী হইত। এ্কে তো বড়ো লোকেরা একাই একশো, অর্থাৎ যত দিন বাঁচিয়া থাকেন তত দিন অন্তত তাঁহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন— তাহার পরে আবার মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না। ছাড়া দূরে যাক, অনেকে মরার সুযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইঁহাদের সংখ্যা অল্প। নহিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্য ব্যক্তিদের কুটীরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সংকীর্ণ যে, জীবিতের সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্য লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক, অন্য পাঁচ জনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জাল-জালিয়াতি করিয়া ইহকাল পরকাল খোওয়াইতে উদ্যত। এই-যে জীবিতে জীবিতে লড়াই ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মৃতের সঙ্গে জীবিতের লড়াই বড়ো কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত দুর্বলতা সমস্ত খণ্ডতার অতীত, তাহারা কল্পলোকবিহারী— আমরা মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ এবং বহুবিধ আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্তমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন। এইজন্যই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিস্মৃতিলোকে নির্বাসন দিয়া থাকেন— সেখানে কাহারও স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়ো বড়ো মৃতের আওতায় আমাদের মতো ছোটো ছোটো জীবিতকে নিতান্ত বিমর্ষ

মলিন, নিতান্তই কোণ-ঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন উজ্জ্বল সুন্দর করিলেন কেন, মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন একান্ত লোভনীয় হইল কী কারণে।

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বৃথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন, 'ওঠো, জাগো, কাজ করো, সময় নষ্ট করিয়ো না।'

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদেরই পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন: সম্ভবামি যুগে যুগে।

জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থ-প্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরান অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশি যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সংগীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃস্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন, এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃথা গেল। যাইতে দাও। কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে— তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন ধানের খেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর-কোনো কাজ না

করিয়া কেবল প্রবাহ রক্ষা করিবার একটা বৃহৎ সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করি না ; তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলো-ছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি কাঁদি ভালোবাসি, বন্ধুর সঙ্গে অকারণ খেলা করি, স্বজনের সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপ করি, দিনের অধিকাংশ সময়ই চারি পাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্যহীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোনো খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই— আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ ; আমাদের ছোটোখাটো হাসি-কৌতুকেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে, আমাদের ছোটোখাটো আলাপে-বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত।

আমরা যাহাকে ব্যর্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। সূর্য-কিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যন্ত টিঁকে। কিন্তু, সে যাহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না, বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেমনি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর কোনো কাজে লাগি না ; সেজন্য নিজেকে ও অন্যকে কোনো দোষ

না দিয়া, ছট্‌ফট্ না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্ন গানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, তাহা হইলেই সে উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্য ; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি করি তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই, অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারি হইয়া চীন উদ্ধার করিতে নাই গেলাম। দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধার-চেষ্টার মতো এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে— সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল— বোধ করি সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল— তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন স্নিগ্ধসুন্দর বিনম্রকোমল নিষ্ফলতা ভালো।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— পনেরো-আনা এবং বাকি এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশ্যক এবং এক-আনা আবশ্যক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির শান্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয় তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে যখন কোনো-এক দল পনেরো-আনা এক-আনার মতোই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে তাহাদিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

১৩০৯ মাঘ

বসন্তযাপন

এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচি পাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো-এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো-এক আদি যুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি। সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হূহূ করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি না দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি। তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মতো মূঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি, আমাদের সর্বাঙ্গ ঝর্‌ঝর্ মর্‌মর্ করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে, আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এমনিতরো রসে-ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজন্য কাহারও কাছে কোনো জবাবদিহি ছিল না।

যদি বল অনুতাপের দিন তাহার পরে আসিত, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত, সে কথা মানি। যেদিনকার যাহা সেদিনকার তাহা এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশ দিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পুরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু এ-সব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে সন্দেহ

করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অমূলক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্‌ভাগ, পশুভাগ, বর্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মঋতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে শেষ পর্যন্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে রাজি আছি ; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ পড়িয়া পড়িয়া, সমুখে চাহিয়া চাহিয়া, যেটুকু সহজে মনে আসিতেছে সেইটুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে-সমস্ত তাগিদ ছিল, আজও ঠিক সেই-সব তাগিদই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কী বাহাদুরি আছে। মন মস্ত লোক, সে কী না পারে। সে দক্ষিনে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্‌হন্ করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে। পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে। তাহাতে দক্ষিনে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে।

এই তো অল্প দিন হইল, আমাদের আমলকী মউল ও শালের ডাল হইতে খস্‌খস্ করিয়া কেবলই পাতা খসিয়া পড়িতেছিল— ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মতো যেমনি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া

বসিয়াছে মাত্র, অমনি আমাদের বনশ্রেণী পাতা খসানোর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

আমরা মানুষ, আমাদের সেটি হইবার জো নাই। বাহিরে চারি দিকেই যখন হাওয়া-বদল, পাতা-বদল, রঙ-বদল, আমরা তখনও গোরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তার ধুলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনও যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল এখনও সেই লড়ি।

হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই— অনুমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্গুনের প্রায় পনেরোই কি ষোলোই হইবে, বসন্তলক্ষ্মী আজ ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে; পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের হিতের জন্য আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্নতন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্বোচ্চ ব্যাপার নয়, বড়োলাট-ছোটোলাট সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতি বৎসরের সেই চিরন্তন বার্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়— এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ-সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল; বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। বাদলার দিনে যে পড়া যায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না— মানুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষ জড়প্রকৃতির আঁচল-ধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াই চলিতে

হইবে, এমন কী কথা আছে। বিশ্বের সহিত মানুষ নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের খাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজ বন্ধ করিলে, দক্ষিনে হাওয়ার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে, মানুষ জগৎচরাচরের মধ্যে একটা বেসুরের মতো বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথিবিশেষে বেগুন শিম কুষ্মাণ্ড নিষিদ্ধ আছে; আরও কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার— কোন্ ঋতুতে খবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন্ ঋতুতে আপিস কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিজবুদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকারদের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

বসন্তের দিনে-যে বিরহিণীর প্রাণ হাহা করে, এ কথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি— এখন এ কথা লিখিতে আমাদের সংকোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এমনি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসন্তে সমস্ত বনে-উপবনে ফুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়; তখন তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে; তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না; যেখানে দুটো ফল ধরিবে সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল এই অজস্রতার স্রোত রোধ করিবে। সে আপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না; কেবলই কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে, ও যাহাদের সে বালাই নাই তাহারা বেলা চারটে পর্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে। আমরা কি এতই একান্ত মানুষ। আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই। তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব— কোনো অনির্বচনীয়

বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না ?

আমি তো আজ গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানোই যে জীবনের অদ্বিতীয় সার্থকতা, এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়দিদি বনলক্ষ্মীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেখানে আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মতো মিশিতে হইবে; আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্তদিন কাটিবে, মাটিকে আজ দুই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে; বসন্তের হাওয়া যখন বহিবে তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে হুহু করিয়া বহিয়া যাইতে দিই, সেখানে সে যেন এমনতরো কোনো ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে গাছপালারা যে ভাষা না বোঝে। এমনি করিয়া চৈত্রের শেষ পর্যন্ত মাটি বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া, সবুজ করিয়া ছড়াইয়া দিব; আলোতে-ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।

কিন্তু হায়, কোনো কাজই বন্ধ হয় নাই, হিসাবের খাতা সমানই খোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে, কর্মের ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি— এখন বসন্ত আসিলেই কী আর গেলেই কী।

মনুষ্যসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ অবস্থাটা ঠিক নহে। ইহার সংশোধন দরকার। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ির নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কী হইবে। এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতেই পড়িয়া থাকে

তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল। পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটা সংকীর্ণধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন। কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে 'আমি জড় নহি, উদ্ভিদ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ— আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি'! কেন সে এ কথা বলে না 'আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে— স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।'

হায় রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল, তবু তোর পাখা দুটা আজ বদ্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিতেছে— এই কি মানবজন্ম।

১৩০৯ চৈত্র

মন্দির

উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম তখন মনে হইল, একটা যেন কী নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরও যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্‌রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন; এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের হৃদয় এখানে কী কথা গাঁথিয়াছে। ভক্তি কী রহস্য প্রকাশ করিয়াছে। মানুষ অনন্তের মধ্য হইতে আপন অন্তঃকরণে এমন কী বাণী পাইয়াছিল যাহার প্রকাশের প্রকাণ্ড চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

এই যে শতাধিক দেবালয় যাহার অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যা-রতির দীপ জ্বলে না, শঙ্খঘণ্টা নীরব, যাহার ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলি-লুণ্ঠিত, ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তখনকার সেই অজ্ঞাতযুগের ভাষাভারে আক্রান্ত।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগূঢ়নিহিত নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, তাহার বিপুলতা, তাহার অপূর্বত্ব প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন— বিশ্লেষণ করিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে; পাথরকে পরে পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে সমস্ত একসঙ্গে বলে, এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে— সুতরাং মন যে কী বুঝিল, কী শুনিল, কী পাইল, তাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে

সময় পায় না, অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় বুঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম মন্দিরভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি ক্ষোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা তো বলিতে পারি না। মানুষের ছোটোবড়ো ভালোমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা— তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর-কোনো উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমন ভাবে চলিতেছে তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিস চোখে পড়ে যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই— তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেখানে দেয়ালে ইংরাজ-সমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে— কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগ্‌কার্ট হাঁকাইতেছে, কেহ হুইস্ট্‌ খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পল্‌কা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম বুঝি-বা স্বপ্ন দেখিতেছি— কারণ গির্জা সংসারকে সর্বতোভাবে মুছিয়া ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে— তাহা যেন যথাসম্ভব মর্তসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভুবনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয়তো লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরাজি শিক্ষায় আমরা

স্বর্গমর্তকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোনো আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।

এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে— তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসংকোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম— সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলংকৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা সেই বহুদূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে কথা এই— দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ পাপপুণ্য মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনো কালে নূতন নহে; কোনো কালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান; অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না— কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, 'সে কথা যথার্থ— মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি— যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।'

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল— মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটো-বড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল; প্রাকৃত পুরাণ-গুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে: বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। যিনি এক তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে— যিনি এক তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলই আবর্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে পড়িতেছে, পাপপুণ্য আলোকে ছায়ায় সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র— সমস্ত চঞ্চল— ইহারই অন্তরে

নিরলংকার নিভৃত, সেখানে যিনি এক তিনিই বর্তমান। এই অস্থির-সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন, এই পরিবর্তন-পরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব স্বর্গমর্ত বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য, ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত। উপনিষদ এইরূপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

'দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া এক বৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।'

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরূপ সাযুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য, এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে। জীবের সহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে— সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাৎড়াইতে হয় নাই। অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখির মতো করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন; কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোটো পাখি যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান, তাহার মধ্যে নিত্যপরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে; বৃহৎ সত্যদ্রষ্টার যে নিশ্চিন্ত সাহস তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটিই পাখি, ডানায় ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে; ইহারা সখা, ইহারা এক বৃক্ষেই পরিষক্ত; ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর-

একজন সাক্ষী— একজন চঞ্চল, আর-একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে; তাহা দেবালয় হইতে মানবত্বকে মুছিয়া ফেলে নাই, তাহা দুই পাখিকে একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরে আরও যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষি-কবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে-আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই-আমির মধ্যে শান্তং শিবমদ্বৈতম স্তব্ধভাবে আবির্ভূত।

কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বর-মন্দিরে লিখিত নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছবৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া, আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে, সাক্ষিরূপে, ভগবানকে প্রকাশ করিতেছে। নির্জনে নহে, যোগে নহে— সজনে, কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে; তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটোবড়ো সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে; তাহার পর দেখাইয়াছে পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে, তিনি কে। এই ভূমা-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এক কালের সহিত অন্যকাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।

১৩১০ পৌষ

পাগল

পশ্চিমের একটি ছোটো শহর। সম্মুখে বড়ো রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার সবুজ মেঘের মতো স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগল-ছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই শহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরি লেখা পড়িয়া আছে— তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন আপনার আভাস দিয়া যায় তাহা তো আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু যখন সে দেখা দিল তখন তাহাকে শুধু-হাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে সে খুব হিসাবী লোক, সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে; কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে এক দিনের জ্যোতির্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্রমেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরি কাজ আমি মাটি করিলাম; আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না; আজ আমি বর্তমানের কাছে বিকাইলাম।

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই দাবি করে না; তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ, দিব্য গাঁথিয়া গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ

সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাত-সমুদ্র-পারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না— তখন মুহূর্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত খেই হারাইয়া যায় ; তখন বাঁধা কাজের পক্ষে বড়োই মুশকিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়োদিন— এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়, সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্য দিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন, আর এক-একটা দিন পূরা পাগলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি, আমাদের খেপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা খেপামির একপ্রকার বিকাশ কি না এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদানুবাদ চলিতেছে, কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা, খেপামি বই-কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট-পালট করিতেই আসে— তাহা আজিকার এই খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া দিনের মতো হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায় ; কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে।

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্র মূর্তি এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুন্দর শান্তচ্ছবি!

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত! জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাব-কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দিভৃঙ্গির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে এক ফোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা বলিতে পারি না— ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গেছে— আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়— এইজন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে, আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে; এইজন্য, কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত, আর আনন্দের পক্ষে ভালো মন্দ দুইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, 'সেন্টি্ফ্যুগল'; তিনি কেবল নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত

করিয়া কুণ্ডলী-আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখি এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্‌ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়ী রূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারের একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে; ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া দিয়া, যাহা নাই তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জস্যের সুর ইঁহার নহে; পিনাক ঝংকৃত হয়, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায় এবং কোথা হইতে একটি অপূর্বতা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারই কীর্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারই কীর্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায় সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব সুরে বাজিয়া উঠে সে হইল প্রতিভাবান। পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবানও তাই; কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ-আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্‌ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে, সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালো মন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের

প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও স্বষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়। সংহারের রক্ত-আকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয়নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্‌ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্র-সংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

আমাদের এই খেপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে, স্বষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে, আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্তি জাগিয়াছে। সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়োচাল দেওয়া মুদির দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সরু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতি-দিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। রোজ এই ক'টা জিনিসের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এত দিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভালো করিয়া দেখিতেছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই

সমস্তই আমার চারি দিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই, তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন; সেই অপূর্ব, অপরিচিত, অপরূপ, এই মুদির দোকানের খোড়োচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই— কেবল, যে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায় সে আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য এই যে, ঐ সম্মুখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিস আমার কাছে একটি বহুসুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরী-শংকরের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এমনি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছিলাম সে আমার ঘরকন্নার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতিমুহূর্তের বাঁধা বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম, তাহার মতো দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিস কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালোরূপ জানি মনে করিয়া তাহার চারি দিকে সীমানা আঁকিয়া দিয়া খাতির-জমা হইয়া বসিয়া ছিলাম, সে দেখি কখন এক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্বরহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক দিয়া, স্থিতির দিক দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তুর-সংগত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক হইতে, ঐ শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না— আশ্চর্য! ও কে। যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি সেই এ কে। যে এক দিকে ঘরের সে আর-এক দিকে অন্তরের, যে এক দিকে কাজের সে আর-এক দিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে এক দিকে স্পর্শ করিতেছি সে আর-এক দিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত—যে এক দিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে সে আর-এক দিকে ভয়ংকর খাপছাড়া, আপনাতে আপনি।

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারি দিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা— আজ দেখিতেছি, মহা-অপূর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়োসাহেবের মতো অত্যন্ত সুগম্ভীর হিসাবী লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি— আজ সেই বড়োসাহেবের চেয়ে যিনি বড়ো সেই মস্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে স্থলে আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল। আমার জরুরি কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম, তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক।

১৩১১ শ্রাবণ

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসংকর দেখা দেয়— জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে— কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ-সমস্ত বিপর্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্র সাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে কখনও বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না ; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে, মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালীবনরাজির নীলতল প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণবাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এ দিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্‌বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত

কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকাধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে-মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর-একজন গ্রীষ্মের তলপি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাত। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে সে ক্ষুদ্র নহে; ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কল্‌কা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুল-কাটা। ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণীপথে বিচরণ করে তাহা রঙবেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাত জোড় মেলাইবার জন্য। তাহারা জানে না, বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে দুই দিয়া ভাগ করো— ৩৬ পর্যন্ত বেশ মেলে, কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্টো পাঁচটি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এইজন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেইটাকে নাড়া দিয়া তাহার যতরকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে, সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না; সেই তো নৃত্যপরা

উর্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয়, সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব-নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ঐ বৈশ্য। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্বৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল ঋতুতেই, কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এইজন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তা ঘর ভরিয়া পরিণতি-রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ-হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহণীয় জিনিস একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দী তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এইজন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল— বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ঐখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা; ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণগ্রহণ আর গ্রীষ্মে স্বাদগ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা, একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না; গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই; কেননা শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি

নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা-মাঠ-ঘাটে বেনামী করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই; কেননা বর্ষাঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার সঙ্গে কোনো দিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল ফসল নির্ভর করে, কিন্তু সে তেমন ধনী নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে-ঘাটে পত্রে-পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার-ভাণ্ডারের উদ্‌বৃত্ত।

এইজন্য বর্ষাঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই, ফলেও অধিকার নাই; তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে— কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষাঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। এইজন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য কাজ-কর্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পাল্কির বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দানশিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়বধূর পর্দা থাকে না। বাদ্‌লার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে, তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী-বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবি লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক-ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে।

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেণ্ট আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাবলিক ওয়ার্ক্‌স্ ডিপার্টমেণ্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবার বেহিসাবি। সরকারি হিসাব-পরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামখা এত বড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না; এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত-যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারও কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই। আমাদের শক্তির পক্ষে এ-সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এইজন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড় জমায়, বুদ্ধিবিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে; সেইজন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায়, তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা

টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষাঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সংগীতে, তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাম্ভীর্যে, তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি— কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা-না-একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা, সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই, বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার; আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ এবং আরও বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে হেমন্তে ভরা মাঠ ভরা নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন। তাহার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠ ঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না, যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিস নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে ঘেরিয়া যে

বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ঐ বায়ুমণ্ডলে। ঐখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারী, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞলোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে। পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে; কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ঐ শূন্যে, যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারি দিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানা রঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে। সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই ঊনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়, তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে, কিন্তু এই বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না, কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাতবেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেইজন্য উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত, সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারি দিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ুমণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি, তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত

প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই-সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশবিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রঙ ফলাইবার সুযোগ ; এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গিতে হিল্লোলিত হয়।

এই-সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না, কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার ; এইজন্য অর্থে তাহার সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য, একাগ্র হইয়া লাভ করা ; নৃত্যের লক্ষ্য, বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারি দিকে অবকাশ চাই। এইজন্য হৃদয় অবকাশ দাবি করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি, কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে, অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু-অংশ যেখানে নাই, সেইখানেই ছন্দের প্রাণ— পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজিতে যতিকে বলে pause— কিন্তু pause শব্দে একটা অভাব স্থচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে— কারণ, যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না, নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইশারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বরচনায় কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ

কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র ; আমি নিশ্চয় জানি, সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগসাধন হইতেছে— অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত-কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে, বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয় ; প্রাণ সেই মহা-অবকাশ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তুবাদীরা মনে করে, অবকাশটা নিশ্চল ; কিন্তু যাহারা অবকাশ রসের রসিক তাহারা জানে, বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই, তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে, 'আমরাই যুদ্ধ করিতেছি।' কিন্তু যে সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগযুগান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই-সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে

আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত লোকেরা 'আষাঢ়ে' বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে, এই মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণমঞ্জীরমুখর মাসটি সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পশরায় কেবল বাজে কথার পণ্য। অন্যায় মনে করে না। সকল-কাজের বাহিরের যে দলটি, যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্ত-মণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্মণ্য, এসো এসো ভাবের ভাবুক, রসের রসিক— আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ঐ বাজিল, এসো সমস্ত খেপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চিরবিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে— জাতীপুষ্পসুগন্ধিবনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল— কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।

১৩২১ আষাঢ়

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের যাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনার পুরী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা-মানিকের অলঙ্কারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াক্কড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী। দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায়, 'তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাকবে, তার এক-পা বাইরে যাবে না' তা হলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে, তাতে দেহের প্রাণটা টিঁকে থাকে, কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এইরকম। সে মোহরাক্ষসের হাতে প'ড়ে বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই; চারি দিকে কারুকার্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র। সেই চেড়ীর দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই, তারা শত শত বছর ধ'রে সমস্ত আসা-যাওয়ার পথ আগলে ব'সে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কালটা চলছে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারে নি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য যত সৌন্দর্যই থাক্‌, তার গতিশক্তি যদি না থাকে তা হলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে

আপন পথে চলে যায়; তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে গান জিনিসটা চলছে না। ওস্তাদরা বলছেন, 'গান জিনিসটা তো চলবার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাকবে, তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে।' কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা-কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারব না। আমরা যে-নদী বেয়ে চলেছি সে-নদী চলছে; যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামী নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারের স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে, অতএব বর্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কী। যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে, সেখানকার পক্ষে দামী চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা শহরে আসত। ধনীদের ঘরে মজলিস বসত, ঠিক সময়ে মাথা নাড়তে পারে এমন মাথা গুন্‌তিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতাসভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তান-মান-লয় সমেত বৈঠকি গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে এত বড়ো মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

'চর্চা নেই' ব'লে জবাব দিলে আমি শুনব না। মন নেই বলেই চর্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই

হবে। খুব ভালো রাজত্ব, কিন্তু কী করা যাবে— সে নেই। অথচ, গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাকবে, এ কথা বললে অন্যায় হবে। আমি বলছি নে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে— কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টি্ঁকতে হবে। সে যে বর্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন করে তুলবে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তা হলে কী হত। পনেরো-আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা-কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তা হলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণচণ্ডী-কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছি নে। সাহিত্যের শোভা-যাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে; কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা ক'রে বসে, তা হলে সে পথটাই মাটি আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্র-পারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য-রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লা-মজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালাবদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে।

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো ক'রে মানে তারা বলবে, ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী। তারা এখনও বলে, এ সমস্তই ভুয়ো। বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ঐ কবিকঙ্কণচণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তা হলে এ কথা বলতেই হবে..

নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে-জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়, সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব, গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে নিন্দা করেন, ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এশিয়া থেকে ধাক্কা পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড়-মনের সঙ্গে আর্য-মনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা-সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস রোম পারস্য তাকে কেবলই নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার যে-সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকারবিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম; তারা জানে না, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া

নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়, কারণ বুদ্ধিমাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবনলাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করি নে, তখন অনুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে; কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে, তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চলতে পারি। পথ নানা, অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তা হলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না, তা হলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ ব'লে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচেছে, কিন্তু সংগীতে পৌঁছয় নি। সেইজন্যেই আজও সংগীত জাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেইজন্যে সংগীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচ্ছে, সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ-বিচার নেই। কীর্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠছে সে আচারভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতো অনেক বিষ হজম ক'রে ফেলে। লোকের ভালো লাগছে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না— এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল,

চলতে শুরু করল ; প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী, কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চলতে শুরু করেছে, সে বাঁধন মানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখনকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিঁদুসংগীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক ; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসংগীতের কোনো ভয় নেই, বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে— সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল ক'রে ঘিরে রাখলে তবেই সত্য টিকে থাকবে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক, তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পলুতেয় করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না ; চারি দিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল, আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই— বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংযম দেখি। সীমাটা অন্য-সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাৎ করিয়া আর সংযমটা অন্য-সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ এক দিকে আপনাকে মানিতেছে, আর-এক দিকে অন্য-সমস্তকে মানিতেছে, তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু, কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় একেকে দেখিতেছি। যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে, যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিঁকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎসৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে, পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল, সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন এক দিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র, আর-এক দিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক

প্রকাশ পাইতেছে : সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না— অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কী জ্ঞানে, কী প্রেমে, কী কর্মে, মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে ; এজন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে— নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানের বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে আমাদের শিল্পশাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

'রূপভেদাঃ'— ভেদ লইয়া শুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে, এক-এর সীমা হইতে আর-এর সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা তো ভূতের কীর্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া

আছে; আমাদের সৃষ্টিকার্যে যদি তার অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত কর, তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত, তখনই একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ, তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সংগীতকে প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে 'রূপভেদ' আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রমাণানি' অর্থাৎ পরিমাণ জিনিসটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি, ভেদ নহিলে মিল হয় না এইজন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এইজন্যই সীমা, নহিলে আপনাতে সীমার সার্থকতা নাই—ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারি দিকে মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল, সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া এককে মাপা। তাই দেখি সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম। এক দিকে তাহার রূপের বিশিষ্টতায় চারি দিক হইতে পৃথক ও আপনার মধ্যে বিচিত্র,

আর-এক দিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারি দিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল 'রূপভেদাঃ প্রমাণানি'। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ; একটা অন্তরঙ্গ তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে! চোখ ঠিক যেটা দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ, এ কথা মানা চলিবে না; চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয়, তবে সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র 'রূপভেদাঃ প্রমাণানি'তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন 'ভাবলাবণ্যযোজনং', চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে, চোখের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে। কেননা, শুধু কারুকাজটা সামান্য, চিত্র করা চাই— চিত্রের প্রধান কাজই চিৎ-কে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের একরকম সহজে জানা আছে। এইজন্যই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি 'ভাব' কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ-সকল কথার মুশকিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকারমত ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরও কত কী আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব, তোমার একটা ভাব ; সেই ভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধে সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা একরোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে, তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে, অর্থাৎ আপনার চারি দিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিম্বা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে, সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল, স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিসকেই মনের জিনিস করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি, এই ছবির ভাবটা কী। অর্থাৎ ইহাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে— ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে। দেখিলাম একটা গাছ— কিন্তু গাছ তো ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্য দিয়া তার অন্তরের কথাটা কী, সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের। অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা, সেখানে সেটা চিত্র নয়, সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু রূপ, শুধু ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। 'আমাকে দেখো' 'আমাকে জানো' তাহাদের দাবি এই পর্যন্ত। কিন্তু 'আমাকে রাখো', এ দাবি করিতে হইলে আরও কিছু চাই। মনের আম-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া, ভাব লইয়া, নানা জিনিস হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে 'বোসো,'; কাহাকেও বলে 'আচ্ছা যাও'।

যাহারা আর্টিস্ট্ তাহাদের লক্ষ্য এই যে, তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ মনের দরবারে নিত্য-আসন পাইবে। যে-সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদি রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবে নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিস যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে-বাঁয়ে হেলিলেই সর্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিস সে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'র পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া, পোটো হইয়া, কারিগর হইয়া ওঠে; সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এইজন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মতো দেখে।

যাহা হউক, এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা দুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে কোঠায়

এক হইয়া মিলিয়াছে, তাহার কথা আলোচনা করা যাক। সেটার নাম 'সাদৃশ্যং'। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সে কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন, তবে শাস্ত্রবাক্য তাঁহার পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগোরুকে ঘোড়াগোরু করিয়া আঁকিবার জন্য রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এত বড়ো উদ্যোগপর্ব কেন। তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন, উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্যই উদ্যোগপর্ব, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্য নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর-একটা, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনই রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব-লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনই বোঝা গিয়াছে, গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে, তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না; হয়তো রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়তো ভাবের দিকে, পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল, কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ' বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল, কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে।

চোখ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ালে তাকাইলেই যে লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কি না, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন সূর্যের কিরণকে চারি দিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে, তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্যকে লোকালয়ের সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার সেই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না; সে জানে, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। সর্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে। ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্তা, এরা নানা দিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায়; সে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নহে। সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই— এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে-বাহিরে পুরাপুরি মিল হইয়া গেল— এই তো সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কী।

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনও যে ফুরাইল না। স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা 'বর্ণিকাভঙ্গং'। রঙের মহিমা।

এইখানে বিষম খটকা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন, তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে, আর এই রঙের ভঙ্গি যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল, চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত।

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই-কি। ছুটির পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রঙ আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিস। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে, কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এইজন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে, কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণ টা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ, এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উল্‌টা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালীর মতো। সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্র-কলার 'রূপভেদাঃ প্রমাণানি'। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো, অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রঙগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্যায়ে

পর্যায়ে ইশারায় দেখাইয়া দেয়, ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে সুর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গি দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে ; রেখা যেন অ-রেখার দিকে আপন ইশারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট, আর রঙ জিনিসটা নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা-কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিকোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি, রঙ জিনিসটা রেখা এবং অ-রেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গি। রেখা ও অ-রেখার মিলনে যে ছবির স্থষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অ-রেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে এই রঙগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাত কম নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ, রঙ জিনিসটা মধ্যস্থ ; দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা, তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন, একটা প্রমাণ আছে, তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই, তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া

কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিস নহে। তাহা কবিতার লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁর আর কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মানুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায়, তখনই সে আর থাকিতে পারে না, বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এইজন্যই মানুষের সৃষ্টিতে ভিতর-বাহিরের ঘাতপ্রতিঘাত। এইজন্য মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিস্টের কাজ হয়, তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে, কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়, নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য এক দিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আর-এক দিকে শক্তিস্বাস্থ্যসৌন্দর্য রূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টিকার্য। মনের সৃষ্টিকার্যও এমনিতরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা এক দিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্য দিকে সৌন্দর্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি— যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তার পরে, ছবিতে যেমন 'বর্ণিকাভঙ্গং,' কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা, suggestiveness। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর-একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর-একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর-বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য। সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য। না, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয়, তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে আবশ্যক হয় না তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা; কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে, তখন তাহা কতটা যে বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না, তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

১৩২২ আষাঢ়

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ও দিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনও সব চুকিয়া যায় নাই, কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, 'তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির হওয়া। যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্যশোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।'

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়; আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি গায়ের গন্ধের মতো; আকাশে আলোকে গাছে-পালায় যা-কিছু রঙ দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রঙ আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি-করা লাল নীল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রঙ নয়; তা কোমলতার রঙ। সেই রঙ দেখিতে পাই ঘাসের পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রঙ ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রঙ-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গাটিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন, যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরও কিছুর আভাস নাই, তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে ; তখন লাল নীল সকলরকম রঙই থাকিতে পারে, কেবল প্রাণের রঙ থাকে না।

শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম, শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই হাসি, এই কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হাল্কাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না ; জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই ; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা ; সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে, তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া-আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া যেন জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে ; তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আট্‌কা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে ; বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায়, শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশপ্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে। এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর-এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সে দিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে, সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলখেতের ঋতু। এই ফসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি-দাদারা এক ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারে পানসত্রের মতো— ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়, বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই ; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই-সব ছোটোদের, এই-সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল

ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নীচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবিদাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, 'হে শরৎ, তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্তমান-টুকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুম্বন করিতেছ। তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।'

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দিভৃঙ্গি শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই। শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া, তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই— হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়, সেই দশমীরাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, 'বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!' তিনি বলিতেছেন, 'ফাল্গুনের মধ্যে মিলনপিপাসিনীর যে রসব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্তনিশ্বাসবিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন-সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার

বিনাশের শ্রী, তোমার সৌন্দর্যের বেদনা, ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ।'

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসিমুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতের বিচ্ছেদবেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়, তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, 'তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।'

১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন

মূল্য ২'০০ টাকা